বানিজ্যিকভাবে মাছচাষ ও বিপণন এর কলাকৌশল

বর্তমানে মৎস্যচাষ একটি অন্যতম লাভজনক পেশা। দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮ শতাংশ এই পেশার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু যথাযথ কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রায়শঃ এ থেকে কাঙ্খিত মুনাফা অর্জিত হয় না। এই পেশায় অধিকতর মুনাফা পেতে হলে সর্বাপেক্ষা সাশ্রয়ী ব্যয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদন ও বিচক্ষণ বিপণন নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের ঋতু, আবহাওয়া ও চাহিদাভিত্তিক উৎপাদন চক্র এবং পরিকল্পিত জৈবিক ও বৈষয়িক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাঙ্খিত উৎপাদন ও মুনাফা লাভের লক্ষ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কারিগরি দিক নির্দেশনা ও কলাকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

অধিক মুনাফা লাভের জন্য ন্যূনতম সময়ে স্বল্পতম বিনিয়োগে সর্বোচ্চ উৎপাদন ও কাঙ্খিত বাজার দর প্রাপ্তি নিশ্চিত করা দরকার। এজন্য মাছচাষের কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিকগুলি ভালভাবে জানা প্রয়োজন।

মাছচাষের কারিগরি দিক মাছচাষ ও বিপণনের কর্মপরিকল্পনা

মাছচাষের কর্মপরিকল্পনাঃ মাছচাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সর্বপ্রথম কাজ হলো সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। নিজের আর্থিক সঙ্গতি, সময়, শ্রম, বাজার, উৎপাদন উপকরণের মূল্য ও সহজলভ্যতা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা, পরিবহন ব্যয়, বিপণন মূল্য, আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, পণ্যের নিরাপত্তা, গুণগতমান, আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক ঝুঁকি সহিষ্ণুতা, নৈতিক ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর প্রভাব ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি খুঁটানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে কার্যকর উৎপাদন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। মাছচাষের বিভিন্ন মাত্রা, পর্যায়, প্রকার ও পদ্ধতি আছে। কোনটি শ্রমঘন, কোনটি পুঁজিঘন, কোনটি প্রযুক্তি-নিবিড় আবার কোনোটি ব্যবস্থাপনা-নির্ভর। আবার প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনারও বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় রয়েছে। হ্যাচারীতে রেণু উৎপাদন ও নার্সারিতে ধানী ও পোনা উৎপাদন বা লালন পুকুরে নলা বা বড়মাছ উৎপাদনের প্রকার ও পদ্ধতিতে ভিন্নতা আছে। এসবে পুঁজি বিনিয়োগ, শ্রম নিয়োজন, প্রযুক্তি ব্যবহার, আয়, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাতেও বিস্তর পার্থক্য আছে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত অভিরুচি, সামর্থ্য এবং মাছচাষ ও বিপণনে উদ্যোক্তার অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাও এক্ষেত্রে গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য। এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক সংবেদনশীলতা, সুলভ উপকরণ প্রাপ্যতা ও বাজার চাহিদার সমন্বয় করে মাছচাষের প্রকার-প্রকরণ নির্ধারণ ও পুঁজি বিনিয়োগ বিধেয়। বস্তুতঃ এসবকিছুই স্বতন্ত্র ও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা ও সমন্বয় করেই একজন উদ্যোক্তা তাঁর নিজস্ব মাছচাষের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন।

বিপণনের কর্মপরিকল্পনা

উৎপাদনের পূর্বেই উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বিপণন পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক। পণ্যটি অভ্যন্তরীণ না আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন করা হবে এটিও আগেই নির্ধারণ করতে হবে। কারণ এর সাথে পণ্যের মান, ভোক্তার চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতা, উৎপাদন ব্যয় এবং আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিযোগিতা জড়িত রয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের এই যুগে এটি অবশ্যই অতীব পরিকল্পিত ও প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। সকল পণ্যের চাহিদা দেশে ও বিদেশে এক নয়। যেমন-আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি, পাবদা, শোল, বাইম ইত্যাদি মাছের চাহিদা বেশি। রুইজাতীয় মাছের বাজার আমাদের দেশেই ভাল। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় ভারত ও মায়ানমার ইতোমধ্যেই রুইজাতীয় মাছের আন্তর্জাতিক বাজার দখল করে নিয়েছে। মোটামুটিভাবে উৎপাদনেয় পণ্যের বাজার জরীপ ও চাহিদা নিরূপণ করে বাজার নিশ্চিত করে তবেই বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সমীচীন। এলাকায় চলমান মৎস্য প্রকল্পসমূহের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি (যদি থাকে) এবং এসব প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজার জরীপ করেও এ বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আবার চাহিদার গুণগতমান ও মাত্রা আছে। শুধু উৎপাদন করলেই হবে না। উৎপাদিত পণ্যের মান ও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে অর্থাৎ ক্রেতার চাহিদামাফিক পণ্যের নির্দিষ্ট মান, প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে। যেমন-কোন এলাকায় হ্যাচারী নির্মাণের আগে দেখতে হবে সেখানে নার্সারির বিস্তার কেমন। আবার রেণু তৈরির ক্ষেত্রে দেখতে হবে কোন প্রজাতির রেণুর চাহিদা বেশি এবং চাহিদা কী পরিমাণ। এটি অবশ্যই পরিকল্পিত ও চাহিদানুপাতে হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারী মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী উদ্যোক্তাদের অনুমোদন দেয়া ও নেয়া উচিত।

মাছচাষের ক্ষেত্রসমূহ

হ্যাচারী ব্যবস্থাপনাঃ হ্যাচারী একটি পুঁজিঘন শ্রমনিবিড় শিল্প। এখানে মাছ ও চিংড়ির (গলদা ও বাগদা) রেণু/পিএল উৎপাদিত হয়ে থাকে। এখানে অল্প জায়গায় স্বল্পতম সময়ে সর্বোচ্চ আয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পরিচালকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এবং শ্রমিকের নিষ্ঠা, সততা ও সময়ানুবর্তিতা সাফল্যের চাবিকাঠি। এই শিল্প ঋতুভিত্তিক। মাটি ও পানির গুণাগুণ হ্যাচারীর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। যথাসময়ে রেণু উৎপাদন না করতে পারলে রেণুর চাহিদা পড়ে যায়। ফলে ভাল দাম পাওয়া যায় না। ইদানীং হ্যাচারীগুলি আন্তঃপ্রজনন দোষে দুষ্ট হওয়ায় এখানকার রেণু বাঁচে না বা বাঁচলেও ভাল বাড়ে না। এজন্য হ্যাচারী অপারেটরের যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা, পেশাগত সততা এবং নীতি ও শ্রেয়বোধ থাকা উচিত। এই শিল্পের প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকার ও পেশাগত দায়বদ্ধতা আবশ্যিক।

নার্সারি ব্যবস্থাপনা

হ্যাচারীর মত নার্সারিও একটি শ্রমনিবিড় শিল্প। এখানে মাছ ও চিংড়ির (গলদা ও বাগদা) রেণু/পিএল উৎপাদিত হয়ে থাকে। নার্সারির জন্য বেশি জায়গা লাগে। হ্যাচারীতে উৎপাদিত রেণুকে নার্সারি পুকুরে ছেড়ে পরিচর্যা করা হয়। এখানে ৭-১৫ দিন বয়সের ধানী পোনা ও ৫-৭.৫ সেমি আকারের আঙ্গুলী পানা বা তদূর্ধ্ব আকারের চারা পোনা উৎপাদন করা হয়। এটি কিছুটা ঋতুভিত্তিক হলেও প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন মাছের পোনা উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখা হয়। মাটি ও পানির গুণাগুণ নার্সারি পুকুরের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা মাটি ও পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ ও উৎকর্ষতা বিধান করা যায়। নার্সারিও একটি অতি লাভজনক ব্যবসা। আগাম মৌসুমে পোনা উৎপাদন করে বা পূর্ববর্তী বছরের পোনা অধিক ঘনত্বে সংরক্ষণ করে আগামী মৌসুমে সরবরাহ করতে পারলে লাভ বহুগুণ হয়। একে পুরাতন বা চাপের-পোনা বলা হয়। এটি শীত-পেরোনো (over-wintered) পোনা। এই পোনার বৃদ্ধিহার তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে অধিকাংশ নার্সারি মালিক ভাটি মৌসুমের কৌলিতাত্ত্বিকভাবে নিম্নমানের কমদামি রেণু সংগ্রহ করে পরবর্তী বছরের জন্য মজুদ করে চাপের-পোনা তৈরি করেন। এটি তাঁরা করেন যতটা না আর্থিক লাভের বিচারে তার চেয়ে অনেক বেশি অজ্ঞতা ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে। এক্ষেত্রে যেটি করণীয় সেটি হলো-রেণু মৌসুমের মাঝামাঝি সময়েই পরবর্তী বছরের জন্য চাপের পোনা সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র পুকুরে অধিক ঘনত্বে মজুদ করতে হয়। পরে চলতি বছরের পোনা বিক্রি শেষ হলে ঐ খালি পুকুরগুলোতে তা ছাড়তে হবে। এতে একদিকে যেমন পুকুরের সদ্ব্যবহার হবে তেমনি গুণগতমানসম্পন্ন চাপের পোনা প্রাপ্তিও নিশ্চিত হবে। এক্ষেত্রেও বাজার চাহিদার ভিত্তিতে পোনা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা উচিত। পোনার প্রজাতি, পরিমাণ ও গুণগতমান এবং উৎপাদনকারীর সততা, সুনাম ও পণ্যের প্রচার-প্রচারণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিক্রয়যোগ্য মাছ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

এটি হ্যাচারী ও নার্সারির মত অত শ্রমনিবিড় নয় বরং তুলনামূলকভাবে সহজ। বাজারে মাছ (খাওয়ার মাছ, টেবিল ফিশ) উৎপাদন সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ। মাছচাষিরা সাধারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজারে মাছ উৎপাদন করতে পারে। শুধু মাছ চুরি রোধ করলেই লাভ নিশ্চিত। তবে যত বেশি পরিকল্পিত পুঁজি বিনিয়োগ ও নিবিড় ব্যবস্থাপনা হবে তত বেশি আয় ও উৎপাদন হবে। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে উৎপাদন ২-৩ গুণ ও লাভ ৪-৫ গুণ বেশি হবে।

ক. উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন
খ. উপযুক্ত পোনা মজুদ সংখ্যা নির্ধারণ
গ. উপযুক্ত আন্তঃপ্রজাতি মজুদ অনুপাত নির্ধারণ
ঘ. উপযুক্ত মাপ ও ওজনের পোনা মজুদ
ঙ. সম আকারের পেক্ষাকৃত বড় পোনা (> ১০ সেমি) মজুদ
চ. চাষ মৌসুমের শুরুতেই পোনা মজুদ

ছ. গুণগতমানসম্পন্ন চাপের পুরাতন পোনা মজুদ
জ. যথানিয়মে পুকুর প্রস্তুতি
ঝ. যথানিয়মে পোনা মজুদ
ঞ. যথানিয়মে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত
ট. যথানিয়মে সাশ্রয়ী পুষ্টিকর তোলা খাবার সরবরাহ
ঠ. মাসে মাসে জাল টানা
ড. মাসিক/ দ্বিমাসিক ভিত্তিতে এক পুকুরের মাছ আরেক পুকুরে স্থানান্তর
ঢ. প্রতি মাসে অপেক্ষাকৃত বড় মাছ তুলে নেয়া ও আহরিত প্রজাতির সমসংখ্যক পোনা অবমুক্ত করা
ণ. সঠিক সময়ে ও সর্বাপেক্ষা অনুকূল শর্তে মাছ আহরণ ও বিপণন করা

উপযুক্ত প্রজাতির সঠিক মাপের সম আকারের নির্ধারিত সংখ্যক অপেক্ষাকৃত বড় পোনা মজুদ

জলাশয়ের মাটি ও পানির গুণাগুণ, আয়তন, গভীরতা, প্রাকৃতিক ও সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ , পানি ও অক্সিজেন সরবরাহ বাজার চাহিদা ও ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী মাছের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। জলাশয়ের সকল স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্যের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত। এজন্য একক প্রজাতির চেয়ে মিশ্র প্রজাতির চাষ অধিকতর লাভজনক হয়। ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি)-এর বড় ও সম আকারের পোনা ছাড়তে হবে। এতে মাছের খাদ্য প্রতিযোগিতা/খাদ্য বঞ্চনা কম হবে এবং বৃদ্ধিহার সুষম হবে। পানি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে পোনার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণভাবে রুইজাতীয় মাছের ক্ষেত্রে এটি বিঘাপ্রতি ১,০০০-৩,০০০ হতে পারে। প্রজাতি নির্বাচনের সময় নির্বাচিত প্রজাতির খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যস্তর (Trophic level) ও বিচরণস্থল (Trophic niche) বিবেচনা করা উচিত।

শীতের শেষে বসন্তের শুরুতেই চাপের পুরাতন পোনা মজুদ

শীতের অব্যবহিত পরেই মাছ দ্রুত বাড়তে থাকে। এসময় আবহাওয়া গরম হয়। প্রজনন মৌসুমও আসন্ন হয়। মাছের চলাচল বেড়ে যায়। ফলে বিপাকীয় প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় মাছ খাদ্য গ্রহণ বেশি করায় বাড়েও বেশি। আর মৌসুমের শুরুতেই পোনা মজুদ করায় মাছ দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় পায়। চাপের পুরাতন পোনার বৃদ্ধিহার উপযুক্ত খাদ্য ও পরিবেশের অভাবে অবদমিত থাকে। নতুন ও অনুকূল পরিবেশে তা দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে পারে।

যথানিয়মে প্রস্তুতকৃত পুকুরে যথানিয়মে পোনা মজুদ

পোনা মজুদের জন্য নির্বাচিত জলাশয় যথানিয়মে তৈরি করতে হয়। পুকুর শুকানো, আগাছা পরিষ্কার, আমাছা নির্মূল, চুন ও সার প্রয়োগ, হররা টানা ; ইত্যাদি যাবতীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ পোনা মজুদের পূর্বেই সমাধান করতে হয়। এরপর যথানিয়মে পোনা মজুদ করতে হয়। পোনা মজুদের সময় পোনা পরিবহন পানি ও পোনা মজুদের পানির তাপমাত্রার সমতারক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রজাতি ও বয়সভেদে এক্ষেত্রে ২০-৪০ সে এর বেশি তাপমাত্রার পার্থক্য ১০%-১০০% পোনার তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পোনা মজুদের সময় পরিবহণজনিত ধকল, আঘাত, ক্ষত, দুর্বলতা ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে তুলতে হবে। এজন্য পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবাহিত হলে পলিথিন ব্যাগগুলিকে প্রথমে মজুদেয় জলাশয়ে ২০-২৫ মিনিট ভাসিয়ে রেখে তারপর ব্যাগের মুখ খুলে শতকরা আধাভাগ (০.৫%) লবণজলে মজুদেয় পোনাগুলিকে ৫-৭ মিনিট রাখা দরকার। ৫ নিযুতাংশ (পিপিএম) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণেও এটি করা যেতে পারে। পরে মজুদেয় জলাশয়ের পানি একটু একটু করে পাত্রে প্রবেশ করাতে হবে ও সেই পরিমাণ পানি পাত্র হতে ফেলে দিতে হবে। এভাবে ১০-১৫ মিনিটেই পাত্রের পানির তাপমাত্রা জলাশয়ের পানির সমান হবে। তখন পাত্রটি ঈষৎ কাত করলেই সুস্থ পোনাগুলি জলাশয়ে স্বেচ্ছায় লাইন ধরে চলে যাবে।
চিংড়ি পোনার ক্ষেত্রে বাড়তি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। চিংড়ি পোনা সাধারণত: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম হতে বিমানে করে পলিথিন ব্যাগে সরবরাহ করা হয় যা চিংড়িচাষিরা দুপুরের সময় পান। তখন ব্যাগের পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে ও অক্সিজেন কমতে থাকে। অনেকক্ষণ অভুক্ত থাকা ও তাপমাত্রা বাড়ার কারণে অপেক্ষাকৃত বড় পোনাগুলি ছোট ও দুর্বল পোনাদের খেতে থাকে। আবার পরিবহন ব্যাগের পানির পিএইচ, লবণমান, হার্ডনেস, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা ইত্যাদি মজুদেয় জলাশয়ের পানি হতে প্রায়শঃ ভিন্ন থাকে। এজন্য তাড়াহুড়া না করে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে প্রতিটি পলিথিন ব্যাগের পোনা আলাদা পাত্রে নিয়ে (যে কর্কশীটের বাক্সে চিংড়িগুলি পাঠানো হয়েছে সেগুলিও এই কাজে ব্যবহার করা যায়) ঐ পলিথিনগুলি মজুদেয় জলাশয়ের পানি দ্বারা পূর্ণ করে তলায় দু-তিনটি ছিদ্র করে পাত্রের উপর টাঙ্গিয়ে রাখলে তলার পাত্র বাতাস হতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাবে, উভয় পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজন, পিএইচ, হার্ডনেস ও লবণমান ক্রমশঃ সমান হয়ে আসবে। যতক্ষণ মজুদেয় জলাশয়ের পানি ঠান্ডা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে হয়। মজুদের সময় পাত্রে আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে বা পাত্রের মাঝখানে পানির ঘূর্ণন সৃষ্টি করলে অপেক্ষাকৃত সবল পোনাগুলি কেন্দ্রাতিগ হয় অর্থাৎ বেরিয়ে আসতে চায় আর দুর্বল পোনাগুলি কেন্দ্রানুগ হয়ে পাত্রের মাঝখানে জমা হতে থাকে। তখন দুর্বলগুলিকে বাদ দিয়ে কেবল সবল পোনাগুলি মজুদ করা যায়। এতে পোনার হিসাব ঠিক থাকে। এভাবে মজুদ করলে ৯৫% পোনার মজুদকালীন মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। এতে আরও একটি বাড়তি সুবিধা এই যে, চিংড়ি নিশাচর হওয়ায় এসময়ে অন্যান্য পোকা-মাকড় বিশ্রামে থাকে এবং এভাবে রাতে মজুদের ফলে চিংড়ি সারারাত নিরাপদে বিচরণ, আহার সংগ্রহ ও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে। মাছের রেণু ও পোনার ক্ষেত্রে অবশ্য খুব ভোরে মজুদের কাজটি সারা উচিত। কারণ মাছ দিনে বিচরণ করে। ঐসময় পানি ঠান্ডা থাকে। দিবাভাবে এরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে পারে।

যথানিয়মে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ও সাশ্রয়ী তোলা খাবারের পুষ্টিকর সুষম খাদ্য যোগান নিশ্চিত করা

পোনা মজুদের পূর্বেই যথানিয়মে পুকুর তৈরি করে (প্রকৃতপক্ষে পুকুরের পানি তৈরি, তবে কথাটি অপ্রচলিত) পোনা মজুদ করা উচিত। পোনা মজুদের পর প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন চক্র চলমান রাখা ও সম্পূরক তোলা খাবারের ব্যবস্থা করা খামারীর সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনার স্তরভেদে কমবেশি হতে পারে। তবে খাদ্যের পুষ্টিমান ও একই সঙ্গে মূল্যের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। নির্বাচিত খাদ্যের মূল্য কম অথচ অধিকতর পুষ্টিমানসম্পন্ন ও এফসিআর (খাদ্য রূপান্তর হার, এক কেজি মাছ উৎপাদনে যতটুকু খাদ্য লাগে) কম ও পরিবেশ-বিরূপ নয় এমন হওয়া উচিত। খাদ্য ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। প্রজাতিভেদে খাদ্যে আমিষের ন্যূনতম পরিমাণ বজায় থাকা উচিত।

মাসে মাসে জাল টানা ও এক পুকুরের মাছ আরেক পুকুরে স্থানান্তর

মাছের পরিমাণ নির্ণয়, খাদ্য নির্ধারণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বৃদ্ধিহার পর্যবেক্ষণ, মাছের ব্যায়াম ও দ্রুতবৃদ্ধি, মাছ আহরণ এবং মাছ স্থানান্তরের জন্য প্রতি মাসে পুকুরে জাল টানা উচিত। এটা মাছের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এক জলাশয় থেকে আরেক জলাশয়ে স্থানান্তর করলে মাছ অসম্ভব দ্রুত বাড়ে। অপেক্ষাকৃত বড় মাছকেও প্রতি মাসে বা দু'মাসে একবার এক জলাশয় থেকে আরেক জলাশয়ে স্থানান্তর করে এদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।

অপেক্ষাকৃত বড় মাছ আহরণ করে ঐ একই প্রজাতির সমসংখ্যক পোনা পুনর্ভরণ

ছোট মাছ অপেক্ষাকৃত বড় মাছের সাথে খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতায় পেরে উঠে না। এজন্য প্রতিমাসে একবার জাল টেনে অপেক্ষাকৃত বড় মাছ তুলে নিলে ছোট মাছ বড় হবার সুযোগ পাবে। এ মাছ থেকে কিছু নগদ টাকাও পাওয়া যাবে। এই টাকা দিয়ে কিছু পোনা কিনে বা পূর্ব হতে চাপ করে রাখা আহরিত প্রজাতির সমসংখ্যক পোনা ছেড়ে পোনার মোট সংখ্যা ও আন্তপ্রজাতি অনুপাত ঠিক রাখা যাবে।

বর্ষাকালে (আষাঢ়- শ্রাবণ) মাছ বাজারজাতকরণ

বর্ষাকালে স্রোত ও পানির গভীরতার কারণে বড়মাছ অপেক্ষাকৃত কম ধরা পড়ে। আবার এ সময়ে শাকসবজির উৎপাদন ও সরবরাহও কম থাকে। ফলে বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যও বেড়ে যায়। খামারীগণ সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসেই মাছ ধরে বিক্রি করে থাকেন। এসময় পুকুরে পানি থাকে না বা ইজারা নেয়া পুকুরের চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তাই চুক্তিপত্রের মেয়াদ আষাঢ়-শ্রাবণ পর্যন্ত করা উচিত। পুকুরে পানি না থাকলে সম্ভব হলে মেশিন দিয়ে পানি সরবরাহ করতে হবে। এতে করে মাছের বৃদ্ধিকাল বাড়বে। যে মাছের ওজন চৈত্র মাসে এক কেজি ছিল বাজার মূল্য ছিল ১০০ টাকা

সেটার ওজন আষাঢ় মাসে হবে দেড় কেজি এবং মূল্য হবে প্রতি কেজি ২০০ টাকা। এতে ঐ মাছটি বিক্রি করে খামারী ৩০০ টাকা পাবে অর্থা সে তিন মাসের ব্যবধানে মূল্য তিনগুণ বেশি হবে।

মাছচাষ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা

মাছচাষ ও বিপণন ব্যবস্থাপনাকে ৪টি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

* মজুদ-পূর্ব ব্যবস্থাপনা
* মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা
* মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ও
* বিপণন ব্যবস্থাপনা।

পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনা

খামারের স্থান নির্বাচন

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যু, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো, মাটি ও পানি গুণগত মানসম্পন্ন, বন্যা এবং নদীর প্রভাবমুক্ত, জৈব পদার্থযুক্ত উর্বর পলিমাটি বা এটেল দোআঁশ মাটি মাছচাষের জন্য আদর্শ। লোকালয়ের কাছে হলে শ্রমিক ও উপকরণ প্রাপ্তি এবং বিপণন সহজ হয়।

খামার নির্মাণ

মস্য খামার এমন হওয়া উচিত যেখানে একই সাথে রেণু ও পোনা উপাদন এবং বাজারেমাছ (বড়মাছ) উপাদনের ব্যবস্থা থাকবে। সুতরাং একই খামারে হ্যাচারী, নার্সারি ও বড়মাছ উপাদনের ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল হয়। এতে উপাদন ব্যয় কম হবে ও মানসম্পন্ন পোনা পাওয়া নিশ্চিত হবে এবং আয়ও বেশি হবে। কৃষি, হাঁস-মুরগিসহ গবাদিপশুর সমন্বিত খামার করলে সামগ্রিকভাবে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বোচ্চ উপাদন ও আয় নিশ্চিত হবে।

পুকুর প্রস্তুতি

যথানিয়মে পুকুর প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। পৌষ-মাঘ মাসে পুকুর শুকিয়ে সেখানে ধৈঞ্চার চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে দিলে জৈব সার তৈরি হয়। পানি/মাটির পিএইচের (pH) মান অনুযায়ী পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণভাবে শতকে এক কেজি হারে পাথুরে চুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরদিন সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিয়ে পুকুরের তলা জীবাণুমুক্ত এবং পানি শোধন করা যায়। শুকনা পুকুর হলে দু-একদিন পর পুকুরে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে হয়। চুন প্রয়োগের এক সপ্তাহ পর শতকে ৫-৭ কেজি গোবর সার/২-৩ কেজি হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা এবং ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৭৫ গ্রাম টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের ৪/৫ দিনের মধ্যেই পানি সবুজাভ বর্ণ ধারণ করে ও পুকুর মাছ ছাড়ার উপযুক্ত হয়। পুকুর প্রস্তুতির সময় পুকুর শুকানো সম্ভব না হলে বারংবার ঘন জাল টেনে রাক্ষুসে ও পুরাতন অবাঞ্ছিত মাছ দূর করতে হবে। ০.৫ পিপিএম হারে রোটেনন পাউডার বা শতকে ৩-৫ গ্রাম হারে ফসটক্সিন ট্যাবলেট প্রয়োগ করেও আমাছা, রাক্ষুসে ও পুরাতন অবাঞ্ছিত মাছ দূর করা যায়।

পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা

*** সঠিক জাত ও প্রজাতি নির্বাচন**

মাছের প্রজাতি ও কৌলিতাত্বিক আদর্শ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জাত নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃপ্রজননদুষ্ট মাছ বেশি বাড়ে না। এজন্য সম্ভব হলে নিজস্ব হ্যাচারীতে খাঁটি প্রজাতির উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন জাত হতে রেণু তৈরি করে নিজস্ব নার্সারিতে লালন করে মজুদ পুকুরে মজুদ করা দরকার। নিজস্ব হ্যাচারী না থাকলে বিশ্বাসযোগ্য হ্যাচারী হতে নির্বাচিত প্রজাতির গুণগতমানসম্পন্ন রেণু/পোনা সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির সংকরায়নে সৃষ্ট সংকর প্রজাতির বৃদ্ধিহার বেশি হলেও পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কায় এদের চাষ করা ঠিক নয়।

*** সঠিক মাপ, পরিমাণ ও সঠিক অনুপাতে নির্ধারিত সংখ্যক অপেক্ষাকৃত বড় পোনা মজুদ**

চাষ ব্যবস্থাপনার স্তর বা মাত্রা অনুযায়ী এবং চাষ ক্ষেত্রের ধারণ ও উপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক ও নির্দিষ্ট সাইজ, সংখ্যক ও ওজনের পোনা মজুদেয়। নার্সারি পুকুরে ধানী বা চারা পুকুরে আঙ্গুলি বা নলা পোনা অথবা মজুদ পুকুরে বড় মাছ উপাদন সকল ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট প্রজাতির পোনাসমূহ সমআকার ও ওজনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে খাদ্য প্রতিযোগিতা কম ও বৃদ্ধিহার সুষম হয়। তবে বড় মাছ উপাদনের ক্ষেত্রে সব সময়েই অপেক্ষাকৃত বড় পোনা মজুদেয়। এতে আয়-উপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। আমাদের দেশের সাধারণ ব্যবস্থাপনায় আঁতুড় বা নার্সারি পুকুরে বিঘায় এক কেজি রেণু বা ১০/১২ দিন বয়সের ১০ কেজি ধানী বা চারা পুকুরে ২০,০০০ টি ১-১.৫ সেমি মাপের পোনা এবং মজুদ পুকুরে ১,০০০-৩,০০০ টি ১০-১৫ সেমি মাপের রুইজাতীয় পোনা মজুদ করা যেতে পারে। ধানী ও ছোট পোনা উপাদনের ক্ষেত্রে একক প্রজাতির রেণু বা ধানী মজুদই শ্রেয়। তবে বড়মাছ উপাদনে মিশ্রচাষ তথা একাধিক প্রজাতির পোনা মজুদ বাণিজ্যিকভাবে অধিকতর লাভজনক। এক্ষেত্রে মজুদেয় প্রজাতিগুলি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত হতে হবে। কেননা সব প্রজাতি একসাথে হয় না। পুকুরের বিদ্যমান খাদ্য কাঠামো (Trophic structure) বিবেচনা করে প্রজাতি নির্বাচন করতে হয়। সাধারণতঃ পুকুরের তলদেশে বিদ্যমান খাদ্যের জন্য তল-আহারি (Bottom feeder), মধ্যভাগের খাদ্যের জন্য মধ্যবিহারি (Column feeder) ও উপরের স্তরের খাদ্যের জন্য উপর-বিহারি (Surface feeder) প্রজাতি মজুদ করতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির সাথে খাদ্য প্রতিযোগিতা না করে অর্থা তাদের পরস্পরের খাদ্য ও খাদ্যস্তর (Trophic level) যেন আলাদা হয়। আবার এক প্রজাতি যেন অপর প্রজাতির খেয়ে না ফেলে। তাছাড়া মস্যভোজী প্রজাতির মাছের সাথে অন্য প্রজাতির মাছ চাষ করা ঠিক নয়। স্বজাতিভোজী বা রাক্ষুসে প্রজাতির চাষের ক্ষেত্রে সকল পোনা অবশ্যই সমআকার ও সম-ওজনের হতে হবে। নতুবা অপেক্ষাকৃত বড়গুলি ছোটগুলিকে খেয়ে ফেলবে। রুইজাতীয় মাছ চাষের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থাপনায় বিঘাপ্রতি নিম্নোক্ত প্রজাতির মাছ বর্ণিত অনুপাত ও সংখ্যায় মজুদ করতে হবে।

নমুনা-১

প্রজাতি	খাদ্যস্তর	আকার (সেমি)	শতকরা হার	মোট	মন্তব্য
কাতলা	উপরের স্তর	১০-১৫	৪০%	৪০০	
রুই	মধ্যস্তর	ঐ	২৫%	২৫০	
মৃগেল/কালিবাউশ	নিম্নস্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
কার্পিও	নিম্নস্তর	ঐ	৮%	৮০	
গ্রাস কার্প	উপরের স্তর	ঐ	১%	১০	
ব্ল্যাক কার্প	নিম্নস্তর	ঐ	১%	১০	
সরপুঁটি	সর্বস্তর	ঐ	১০%	১০০	
শিং/মাগুর	নিম্নস্তর	৫-৮	(+১০%)	১০০	ঐচ্ছিক
খরসুলা	উপরের স্তর	ঐ	(+১০%)	১০০	ঐচ্ছিক

নমুনা-২

প্রজাতি	খাদ্যস্তর	আকার (সেমি)	শতকরা হার	মোট	মন্তব্য
কাতলা	উপরের স্তর	১০-১৫	১৫%	১৫০	
সিলভার কার্প	উপরের স্তর	ঐ	২০%	২০০	
রুই	মধ্যস্তর	ঐ	২০%	২০০	
বিগহেড কার্প	মধ্যস্তর	ঐ	১০%	১০০	
মৃগেল/কালিবাউশ	নিম্নস্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
কার্পিও	নিম্নস্তর	ঐ	৮%	৮০	
গ্রাস কার্প	উপরের স্তর	ঐ	১%	১০	
ব্ল্যাক কার্প	নিম্নস্তর	ঐ	১%	১০	
গলদা চিংড়ি	নিম্নস্তর	৫-৮	(+১০%)	১০০	ঐচ্ছিক
খরসুলা	উপরের স্তর	ঐ	(+১০%)	১০০	ঐচ্ছিক

নমুনা-৩

প্রজাতি	খাদ্যস্তর	আকার (সেমি)	শতকরা হার	মোট	মন্তব্য
কাতলা	উপরের স্তর	১০-১৫	১৫%	১৫০	
সিলভার কার্প	উপরের স্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
রুই	মধ্যস্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
বিগহেড কার্প	মধ্যস্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
মৃগেল/কালিবাউশ	নিম্নস্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
কার্পিও	নিম্নস্তর	ঐ	১৫%	১৫০	
গ্রাস কার্প	উপরের স্তর	ঐ	১%	১০	
ব্ল্যাক কার্প	নিম্নস্তর	ঐ	১%	১০	
নাইলোটিকা	সর্বস্তর	৩-৫	৮%	৮০	মনোসেক্স
খরসুলা	উপরের স্তর	ঐ	(+১০%)	১০০	ঐচ্ছিক

উপরোক্ত রুইজাতীয় মাছের চাষ ব্যবস্থাপনায় বিঘাপ্রতি অতিরিক্ত ১০০-৩০০টি করে গলদা ও শিং-মাগুরের পোনা মজুদ করলে পুকুরের তলার গ্যাস ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণাসহ সার্বিক জৈবিক ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে ও অতিরিক্ত উ্পাদন পাওয়া যাবে। গ্রাস কার্প জলজ আগাছা ও ব্লাক কার্প অবাঞ্ছিত গুগলি-শামুক নিয়ন্ত্রণ করে একদিকে পুকুর ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে আবার অন্যদিকে বাড়তি উ্পাদন যোগ করে। খরসুলা মাছ সবসময় পুকুরের উপরের স্তরে ভেসে বেড়ায়। এরা পুকুরে সর্বদা সন্তরণশীল থেকে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পুকুর প্রহরার কাজ করে। অধিকন্তু পুকুরের শোভাবর্ধন ও অতিরিক্ত উ্পাদনে সহায়তা করে।

নার্সারি পুকুরের চেয়ে মজুদ জলাশয় অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে থাকে। এখানে পানির চাপ, ঘনত্ব, গভীরতা, ঢেউ ও অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক অবস্থা, খাদ্যচক্র এবং সামগ্রিক পরিবেশে প্রায়শঃ ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) ও ২০ গ্রামের কম ওজনের পোনা খাপ খাওয়াতে পারে না। এজন্য উল্লিখিত মাপের চেয়ে বড় মাপের পোনা (দৈর্ঘ্য ও ওজন) মজুদ করতে হয়। এক এক জলাশয়ে এক এক রকম খাদ্যস্তর রয়েছে। খাদ্যস্তরভেদে খাদ্যের ভিন্নতা রয়েছে। আবার প্রজাতিভেদে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ভিন্ন হয়। জলাশয়ের সকল খাদ্যস্তরের সুষম ব্যবহার এবং একই স্তরের বা একই প্রকারের মাছের মধ্যে যাতে খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতা না হয় এজন্য বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়তে হয়। লভ্য খাদ্যের প্রকৃতির উপর প্রজাতি নির্বাচন করা হয়। খাদ্যের প্রাচুর্যের উপর নির্দিষ্ট প্রজাতির পোনার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

পোনা মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

ভৌত নিরাপত্তা

নির্বাচিত জলাশয়ে পোনা মজুদের পর পোনার ভৌত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জলাশয়ের চারপাশ প্রাচীর, বাঁশের বেড়া বা ঘন প্লাস্টিক নেট দিয়ে ঘিরে দিলে চোর, সাপ, ব্যাং, উদবিড়াল, শিয়াল ইত্যাদির উপদ্রব কম হয়। জলাশয়ে পর্যাপ্ত আলো ও প্রহরার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

সুষম পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা

মজুদকৃত পোনার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহকৃত খাদ্যে ন্যূনতম ২০% প্রাণীজ আমিষ থাকা প্রয়োজন। খৈল, গমের ভূষি, চাউলের কুঁড়া, ক্ষুদ, আটা, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স মিশিয়ে খাদ্য বানিয়ে নেয়া যায়। খাদ্য সরাসরি প্রয়োগ না করে মেশিনে পিলেট বানিয়ে বা নিদেনপক্ষে হাতে বল বানালে খাদ্যের পুষ্টিমান মোটামুটি ঠিক থাকে ও অপচয় কম হয়।

পানির আদর্শ মাত্রার ভৌত-রাসায়নিক মান সংরক্ষণ

পোনা মজুদকৃত জলাশয়ের পানির ভৌত-রাসায়নিক মান সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। পানির সেকিডিস্ক মান, গভীরতা, তাপমাত্রা, পিএইচ, খরতা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রেট, সালফার, মিথেন ইত্যাদির মান সর্বাধিক অনুকূল রাখতে হবে। নীচের সারণীতে আদর্শ/নিরাপদ মান প্রদত্ত হলো।

ক্রমিক নং	ভৌত-রাসায়ণিক নিয়ামক	আদর্শ/নিরাপদ মান
	(parameters)	
১	সেকিডিস্ক	> ২৫ সেমি
২	গভীরতা	৫-৮ ফুট
৩	তাপমাত্রা	২৮-৩১০ সে
৪	পিএইচ	৬.৫-৮.৫
৫	ক্ষারত্ব ও খরতা	৪০-২০০ পিপিএম
৬	দ্রবীভূত অক্সিজেন	৫-৭ পিপিএম
৭	কার্বন ডাই অক্সাইড	< ১২ পিপিএম
৮	নাইট্রাইট	<০.১ পিপিএম
৯	নাইট্রেট	< ৫০ পিপিএম
১০	হাইড্রোজেন সালফাইড	< ০.০০২ পিপিএম
১১	কার্বন ডাই অক্সাইড	< ১২ পিপিএম
১২	ক্যালসিয়াম	১০-১২ পিপিএম
১৩	ম্যাগনেসিয়াম	১০-১২ পিপিএম
১৪	এমোনিয়া	< ০.০২৫ পিপিএম
১৫	লবণাক্ততা কার্প:	< ৭ পিপিটি; গলদা
		< ৫ পিপিটি; বাগদা:
		< ২৫ পিপিটি
১৬	টিডিএস (দ্রবীভূত পদার্থ সমগ্র)	< ৩০০ পিপিএম
১৭	লৌহ	< ০.০২ পিপিএম
১৮	ফসফরাস	০.১৫ পিপিএম

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা

নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ও পানির গুণগতমান রক্ষা করলে মাছ সুস্থ থাকে ও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দুর্বল থাকা ও সঠিক বৃদ্ধি না পাওয়া রোগের পূর্ব লক্ষণ। এজন্য পুকুরে প্রতি পনেরো দিনে একবার জাল টেনে বা খেপলা জাল দিয়ে কিছু মাছ তুলে দৈবচয়নের মাধ্যমে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার। সকল প্রজাতির অন্ততঃ দশটি করে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। নীচের সারণী মোতাবেক এটি করা যেতে পারে:

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণ বিষয়	সুস্থ, নীরোগ পরিপুষ্ট মাছ	অসুস্থ/রোগাক্রান্ত/পুষ্টিহীন মাছ
১.	সাধারণ বহিরাবরণ	ত্বক ও আঁইশ চকচকে, চোখ উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক, ফুলকা রক্তিম, শরীরে কোনো লাল/কালো দাগ বা ক্ষত না থাকা, পাখনা পরিপূর্ণ, স্বাভাবিক পেট, বয়স ও প্রজাতিভিত্তিক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও শরীর গঠনতা ও অনুপাত স্বাভাবিক।	ত্বক ও আঁইশ খসখসে, চোখ মলিন, কোটরাগত, ফুলকা ফ্যাকাসে, শরীরে লাল/কালো দাগ বা ক্ষত পাখনা খসিত, পেট ফোলা বা শুকনো, বয়স ও প্রজাতিভিত্তিক দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও শরীর গঠনতা ও অনুপাত অস্বাভাবিক।
২	মাছের শ্লেষ্মা (slime)	স্বাভাবিক	অস্বাভাবিক (থাকে না বা মাত্রাতিরিক্ত থাকে)
৩	চঞ্চলতা	ছটফট করে	ছটফট করে না
৪	বর্তমান দৈর্ঘ্য পার্থক্য	বৃদ্ধি পায়	প্রায় একইরূপ থাকে
৫	বর্তমান ওজন পার্থক্য	বৃদ্ধি পায়	প্রায় একইরূপ বা ক্ষেত্রভেদে কম হয়
৬	দলবদ্ধতা	সাবলীলভাবে ঝাঁকে চলাচল করে	দলছুট হয়ে থাকে
৭	বহিঃপরজীবীর উপস্থিতি	উকুন, আরগুলাস, জোঁক ইত্যাদি গায়ে লেগে থাকে না	থাকতে পারে
৮	অন্তঃপরজীবীর উপস্থিতি নিশ্চিত, নির্ণয় ও শীর্ণ হতে পারে।	যকৃত, অন্ত্রে ফিতা কৃমি, গোল কৃমি থাকে না	ফিতা কৃমি, গোল কৃমিতে আক্রান্ত হবে মাছ

রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয়। উপরের সারণীর ১-৭ নং ক্রমিকে বর্ণিত সমস্যাদি পুকুরের পানি পরিবর্তন, পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, আগাছা পরিষ্কার ও পর্যাপ্ত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করে দূর করা যেতে পারে। ৮ নং ক্রমিকে বর্ণিত সমস্যাটি পুকুরের সার্বিক অব্যবস্থাপনার কারণে হয়ে থাকে। মাছকে ব্যবচ্ছেদ করেই বিষয়টি নিশ্চিত হতে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন। অন্তঃপরজীবী আক্রান্ত মাছ না খাওয়া ও বাজারজাত না করে বরং জনস্বার্থে সমস্ত মাছ ধরে নিরাপদ স্থানে পুঁতে ফেলাই উত্তম। কারণ অনেক অন্তঃপরজীবী মানবদেহেও সংক্রমণ ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে পুকুরটি শুকিয়ে চুন দিয়ে নতুন করে মাছ চাষের জন্য তৈরি করা উচিত।

মৎস্য বিপণন ব্যবস্থাপনা

সঠিক সময়ে ও সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী মৎস্য আহরণ ও বিপণন সঠিক সময়ে ও সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী মৎস্য আহরণ ও বিপণন নিশ্চিত করতে হবে। অমাদের দেশে সাধারণতঃ বর্ষাকালে খাল-বিল-নদী-নালা-প্লাবনভূমি বর্ষণ বা পাহাড়ি ঢলে প্লাবিত হয়। এসময় অধিকাংশ মাছই প্রজনন করে। আশ্বিন-কার্তিক পর্যন্ত এসব জলাশয়ে এদের রেণু পোনা ও ছোট মাছ বৃদ্ধির সময় পায়। আশ্বিনের শেষে এসব জলাশয়ের পানি কমতে থাকলে এদের বিচরণ ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ও বিভিন্নভাবে ধৃত হয়। আহরিত এসব মাছের সরবরাহ বাজারে বেশি হলে দামও কম হয়। আবার অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে নীচু জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান আবাদের জন্য জমি তৈরির সময় সেচ করে মাছ ধরা হয়। চিংড়ি ঘেরেও রুইজাতীয় মাছসহ প্রচুর ছোট মাছ জন্মে। যা আহরণ করে বাজারজাত করাতেও মাছের দাম কমে যায়। উপরন্তু প্রচুর হৈমন্তি শাকসব্জি বাজারে উঠে। এজন্য এসময় চাষকৃত মাছ বাজারজাত না করাই ভালো। আবার মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখে অধিকাংশ পুকুর-দীঘিই প্রচন্ড খরার ফলে পানিশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে মৎস্যচাষিরা বাধ্য হয়ে এসব মাছ ধরে বাজারজাত করে। তাই জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে অধিকাংশ পুকুরেই আর বিক্রয়যোগ্য মাছ থাকে না। খাল-বিলে এসময় বর্ষার পানি জমতে থাকে ও কম মাছ ধরা পড়ে। ফলে এসময় বাজারে মাছের দাম বেড়ে যায়। তাই এসময়েই চাষকৃত পুকুরের মাছ আহরণ ও বিপণন করা বেশি লাভজনক।

মাছ আহরণ ও বিপণন ব্যয় যেন কম থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। এজন্য জেলেদের নিকট সরাসরি মন হিসাবে মাছ বিক্রি করলে তারা নিজ খরচে মাছ ধরে কিনে নিবে। নতুবা দিন প্রতি বা টান প্রতি একটি বড় অঙ্ক জেলেরা নিয়ে যায়। নিজ খরচে মাছ পরিবহণ করে আড়তে নিয়ে। শুধু বিক্রির জন্য মোট বিক্রয় মূল্যের ৫% আড়ৎদারকে দিতে হয়। বিভিন্ন খাজনাসহ গড়ে ১০% আহরণ, ১০% পরিবহণ এবং আড়ৎদারির খাতে ব্যয় হয়। এজন্য এলাকার সকল মৎস্যচাষি সমিতিভুক্ত হয়ে বা নিজস্ব জাল, পরিবহণ বা নিজ পুকুর পাড়ে মৎস্য অবতরণ ও বিক্রয় কেন্দ্র বানিয়ে এসব কাজ সমাধা করলে উল্লিখিত ২০% ব্যয় সাশ্রয় হয়েও বাজার ও ডাক নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে অতিরিক্ত আরও ২০% আয় বেশি হতে পারে।

প্রজাতি, আকার ও মানভিত্তিক মৎস্য গ্রেডিং

প্রজাতি, আকার ও মানভিত্তিক মৎস্য গ্রেডিং ক্রেতাকে অধিক আকৃষ্ট ও অধিক মূল্য প্রদানের জন্য অনুপ্রাণিত করে। সকল ক্রেতার চাহিদা, রুচি ও ক্রয় ক্ষমতা এক নয় বলে গ্রেডিং করে মৎস্য বিপণন করা হলে যাঁর যে ধরনের পছন্দ তিনি মাছ ক্রয় করতে পারবেন। এতে তুলনামূলকভাবে বিক্রেতার লাভ বেশি হয়। এজন্য পাইকারি বিক্রয়ের চেয়ে খুচরা বিক্রয়ে লাভ বেশি হয়।

আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ

মাছ চাষ ও বিপণনের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ সঠিক হিসাব না রাখলে লাভ-লোকসানর সঠিক হিসাবও পাওয়া যায়না। প্রতিদিনের আয়-ব্যয় ও উৎপাদন বিবরণী স্বতন্ত্র রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হয় ও এসব পর্যালোচনা করলে পরবর্তী বছর আরও লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

মাছচাষের অর্থনৈতিক দিক

সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী সঠিক কর্মপরিকল্পনা

স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ আয়-উৎপাদনই ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য। পুঁজি বিনিয়োগ বা উৎপাদন উপকরণের পরিমাণ বেশি করা হলেও উৎপাদন ও আয় তদানুযায়ী হবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। কারণ মৎস্য চাষ অতি সংবেদনশীল বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। উপকরণ কিছু বৃদ্ধি করলেও উৎপাদনের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য খামারীর মনে রাখা উচিত সর্বোচ্চ জৈবিক উৎপাদন (Asymptote) নয় বরং অর্থনৈতিক লাভজনক উৎপাদনই (Highest economic production) মূল উদ্দেশ্য।

সর্বাপেক্ষা সাশ্রয়ী সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার

সর্বাপেক্ষা সাশ্রয়ী অথচ সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহার মাছচাষে সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রতিযোগিতামূলক প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে সর্বদা। এজন্য দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টিভি ও বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এসব জানতে হবে।

দক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থাপনা

খামার পরিচালনার দক্ষতা খামারের আয় ও উৎপাদন বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। এবিষয়টি খামারীদেরকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সাশ্রয়ী অথচ আদর্শ খাদ্য ব্যবস্থাপনা লাভজনক মাছচাষের প্রথম ও প্রধান শর্ত। প্রত্যেক খামারীকে প্রাপ্ত কাঁচামাল ব্যবহার করে সাশ্রয়ী সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, ছোটমাছের গুঁড়া, কুঁড়া, চাউলের ক্ষুদ ইত্যাদি সুলভ ও সাশ্রয়ী।

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ পণ্যের মান যত উন্নত হবে এর মূল্য তত বেশি হবে। উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তার হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত সকল স্তরে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বিশেষ জরুরি। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এজন্য সাম্প্রতিককালে জৈব ও পরিবেশ-বান্ধব মাছচাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ঔষধযুক্ত (নাইট্রোফিউরান) সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার, পুকুর প্রস্তুতিতে থায়োডিন, ফসটক্সিন ও পচনরোধে ফরমালিন প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই করা যাবে না।

চাহিদা ভিত্তিক মৎস্য আহরণ ও বিপণন সূচি প্রস্তুত

বাজারে চাহিদা কখন সবচেয়ে বেশি এবং উৎপাদনের সমন্বয় করে আহরণ ও বিপণন পরিকল্পনা খামারীকে সাফল্যের অধিকারী করে। উৎপাদন মৌসুমে বাজারে সরবরাহ বেশি থাকে এবং এসময় পণ্যের মূল্য কম থাকে। বাজারের কয়েক বছরের আমদানি-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলেই মাছের ভরা ও খরা মৌসুম জানা যাবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিষয় বিবেচনা করেই খামারীকে মাছ বাজারজাত করার প্রকৃষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে।

পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস, চাহিদাভিত্তিক বিশেষায়িত সেবা ও আকর্ষণীয় পরিবেশনা

উৎপাদিত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস, চাহিদাভিত্তিক বিশেষায়িত সেবা ও আকর্ষণীয় পরিবেশনা পণ্যের আকর্ষণ, মান ও মূল্য বৃদ্ধি করে। এসব বিষয়ে খামারীদের সঠিক জ্ঞান না থাকার ক্ষেত্রে বিশেষে পণ্যের মূল্য ১০%-২০% পর্যন্ত কম পেয়ে থাকে। অনেকে ড্রাম বা পলিথিনের হাপায় জীবন্ত মাছ পরিবহনের মাধ্যমে বাজারজাত করে। ১৫%-২৫% পর্যন্ত মূল্য বেশি পায়ে থাকে। বাজারে দাম কম হলে তা ফেরতও আনতে পারে। ফলে তাকে আড়তদারের হাতে জিম্মি হতে হয় না। কেউ কেউ নির্দিষ্ট প্রজাতির নির্দিষ্ট মাপের নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের সরবরাহ চায়। কেউ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পণ্যের সরবরাহ চায়। এধরনের বিশেষায়িত সেবার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য অনেক বেশি পাওয়া যায়। আবার পণ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে যেমন-কাটামাছ (Dressed fish), শুটকি, ফিশমিল, কৌটাজাত, লোনা (salted) মাছ হিসাবে সরবরাহ করে বেশি মূল্য পাওয়া যায়। আকর্ষণীয় মোড়ক, উপস্থাপনা এবং উন্নত পরিবেশনাও পণ্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি করে।

মাছচাষের নৈতিক দিক

নীতি-নৈতিকতা (Ethics)

সকল পেশাতেই নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতি মুনাফা লাভের মনোবৃত্তি ও মানুষের প্রতি মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অভাবের ফলে এ জাতীয় পেশা বর্তমানে অত্যন্ত কলুষিত হয়েছে। হ্যাচারীতে নিম্নমানের রেণুপোনা উৎপাদন, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার, চিংড়িতে কৃত্রিম ওজন বৃদ্ধি, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বিষাক্ত ফরমালিন ব্যবহার, ওজনে কারচুপি ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। পেশাতে অসাধুতা যুক্ত হলে উন্নতি আশা করা অসম্ভব। কারণ পণ্য মানসম্মত হলে অবশ্যই তা যথাযোগ্য মূল্য পাবে। এটা যেমন রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষটিকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতে হবে।

পরিবেশ সুরক্ষা

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাভাবে আমাদের পরিবেশ প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। জনস্বস্থ্যের কথা বিবেচনা করে এ বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়োজন রয়েছে। যত্রতত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া কাম্য নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্জ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিষ্কাষণের ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। কৃষি জমিতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পুকুর নির্মাণও কৃষি শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। পরিবেশ রক্ষাতে এসব বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা

বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ ক্ষুদ্র খামারীর স্বার্থহানি ঘটাতে পারে। ফলে ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি, ভূমি মালিকানা ও ভূমি ব্যবহারের চিরায়ত চিত্রে পরিবর্তন আসছে। ক্ষুদ্র ভূমি মালিকবৃন্দের সমবায়ভিত্তিক সংগঠিত হয়ে ঘের ব্যবস্থাপনায় অধিকতর মুনাফা অর্জন ও আর্থসামাজিক অবস্থান উন্নয়নের নজির আছে। ঘেরে ব্যক্তিস্বার্থে লোনা পানি ঢুকিয়ে মাছচাষ করার ফলে আবহমানকালের চিরাচরিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এভাবে ভূমির অবক্ষয় ও ভূমির প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে।

লেখক: কৃষিবিদ ড. এ, কে, এম, আমিনুল হক
জেলা মৎস্য অফিসার, মানিকগঞ্জ।